



## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ সিডও সনদ, সংবিধান ও কোরআন-সুন্নাহ'র সমন্বয়ের ফসল?

### নাতিকের ধর্মকথা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নাকি সিডও সনদ, সংবিধান ও কোরআন-সুন্নাহ'র সমন্বয়ের ফসল? সমন্বয় আদৌ কি সম্ভব? এমন জগাখিচুরি সমন্বয়ে 'নারীর উন্নয়ন' কি সম্ভব?

আমাদের বর্তমান ডিজিটাল সরকার (?) নানাবিধ নীতি-চুক্তি-প্রস্তাবনা প্রণয়নে ব্যস্ত। ইতোমধ্যেই আমরা শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, স্বাস্থ্য নীতি, শিশু নীতি, কয়লা নীতি (একাধিক), ওষুধ নীতি, গ্যাস নীতি, পিএসসি খসড়া চুক্তি ইত্যাদি পেয়েছি- আর সম্প্রতি পেলাম “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১”। আজ কেবল নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে কলম ধরা।

নারী নীতির ভূমিকার (১ম ভাগ ১ নং অনুচ্ছেদ) শুরুর কয়েক লাইনে বলা হয়েছে: “বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমস্যোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য”। ১ম ভাগ ৪.১ নং অনুচ্ছেদটির শিরোনামই হচ্ছে “নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ” (সিডও সনদ) এবং ২য় ভাগের ১৭.২ ধারায় নারী নীতি ২১১ এর লক্ষ হিসাবে বলা হয়েছে: “নারীর প্রতি সকল প্রাকার বৈষম্য বিলোপ সনদ

(CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।” ১ম ভাগের ৫ নং অনুচ্ছেদ (নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান) এ শুরুতেই সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে: “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী”, এছাড়াও সেখানে সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) ও ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই অনেকের মধ্যেই একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। আওয়ামী লীগ হয়েতো একটা যুগান্তকারী নারী নীতি জাতিকে উপহার দিতে যাচ্ছে, নারী প্রশ্নে শক্ত ও প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে- এমন স্পন্দনের সাথে কারও কারও আশংকাও ছিল মোলাদের সাথে পেরে উঠবে তো। অবশ্য আমার ছিল সন্দেহ। হিজাব পরে ভোট ভিক্ষা চাওয়া হাসিনা, “নৌকার মালিক তুই আল্লাহ”র আওয়ামী লীগ, খেলাফত মজলিশের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী আওয়ামী লীগ আমার চোখে কখনোই প্রগতিশীল ছিল না, ফলে আশাস্থিত হওয়া বা স্পন্দনের স্বত্ত্বাবনাও ছিল না। সন্দেহ ছিল, প্রশ্নও ছিল- আওয়ামী লীগ আসলে কী করতে যাচ্ছে এই নীতি নিয়ে এবং কী আছে এতে।

জবাব মিলতে দেরি হয় না- হাতে নারী নীতি ২০১১ চলে আসে, এবং আমিনীর ছ্রংকার শুনে- হাসিনা থেকে শুরু করে আওয়ামী মন্ত্রী-মিনিস্টার সবাই সমন্বয়ে জানান দিতে থাকে, এই নারী নীতির সাথে নাকি কোরআন-সুন্নাহ'র কোন বিরোধ নাই। এ দাবিও করা হয়েছে যে (নারী নীতিতেও অঙ্গীকার করা হয়েছে)- ‘এটা সিডও সনদকে বাস্তবায়ন করবে!’ -’এটা বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে!’ এসব কি কোরআন-সুন্নাহ'র পরিপূরক কোন নীতি দ্বারা সম্ভব? প্রথমে সেটাই দেখি তাহলে।

**কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে:** সিডও সনদ বাস্তবায়ন কি কোরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সম্ভব? সিডও সনদ মানেই হচ্ছে নারীর প্রতি যেকোন বৈষম্য বিলোপ। কোরআন-সুন্নাহ' কি এই বৈষম্য বিলোপের পক্ষে? মোটেও না, কখনো না। উল্লেখ কোরআন নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে সমর্থন করে এবং নারীকে পুরুষের অধীন মনে করে। সুতরাং সিডও সনদ আর কোরআন-সুন্নাহ' সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর পরম্পর বিরোধী।

আমাদের সংবিধানের সাথে কি কোরআন-সুন্নাহ' বিরোধ নেই? সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) অনুচ্ছেদগুলোতে সরাসরি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ব্যাপারে বলা আছে, সেখানে কোরআন কি মনে করে? কোরআনের চোখে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে, ১ জন পুরুষ সাক্ষ্য = ২ নারী সাক্ষ্য, স্বামী স্ত্রীকে প্রাহার করতে পারে ইত্যাদি। এ সবই সংবিধানের উপরের

সংবিধান রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের কথা বলে, বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়, সংবিধান পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন, মুসলিম বিবাহ আইনকে সমর্থন করে। আবার উল্টোদিকে- উপরিউক্ত ধারাগুলো যেমন আছে, তেমনি আমাদের সংবিধান সাক্ষ্য আইন ১৯৭২কে, চুক্তি আইন ১৯৭২কে সমর্থন করে। এই আইনের বলে- আদালতে ও নির্বাচনে, চুক্তি সম্পাদনে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পায়। যা সরাসরি কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে স্ত্রীকে প্রহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যদিও কোরআনে স্ত্রীকে প্রহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ধারাগুলোর বিপরীত। যদিও, উত্তরাধিকার আইন থেকে শুরু করে অনেকটিছুই সংবিধান সমর্থিত আইনে কোরআন-সুন্নাহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে- যা আবার সংবিধানের উপরের ধারাগুলোর বিপরীত, সুতরাং- বলা যায় সংবিধান নিজেই স্ববিরোধিতায় ভরপুর। আমাদের সংবিধানে যেমন কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় আছে, তেমনি পরিপূরক বিষয়দণ্ডিও আছে। সংবিধান রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের কথা বলে, বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়, সংবিধান পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন, মুসলিম বিবাহ আইনকে সমর্থন করে। আবার উল্টোদিকে- উপরিউক্ত ধারাগুলো যেমন আছে, তেমনি আমাদের সংবিধান সাক্ষ্য আইন ১৯৭২কে, চুক্তি আইন ১৯৭২কে সমর্থন করে। এই আইনের বলে- আদালতে ও নির্বাচনে, চুক্তি সম্পাদনে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পায়। যা সরাসরি কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে স্ত্রীকে প্রহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যদিও কোরআনে স্ত্রীকে প্রহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, কেন নীতিই একই সাথে কোরআন-সুন্নাহ আর সিডও সন্দ কিংবা সংবিধান ও কোরআন-সুন্নাহর পরিপূরক হতে পারে না। তাহলে- আমাদের নারী নীতি ২০১১ প্রকৃত প্রস্তাবে কীরুপ? কার পরিপূরক- কার বিপরীত? সেটাই তবে দেখা যাক।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ কী আছে?

প্রথমেই দেখা যাক প্রথম ভাগের ৪.১ অনুচ্ছেদ। যে ৪.১ অনুচ্ছেদ নিয়ে এত কথাবার্তা- সেটাতে আসলে তেমন কিছুই

নেই। শিরোনামটাই কেবল “নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সন্দ”! তেওঁরে আছে- সিডও সন্দে বাংলাদেশ করে কীভাবে স্বাক্ষর করেছে। ফলাও করে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ সিডও সন্দে প্রথম দশ স্বাক্ষরকারী দেশের একটা। সেই স্বাক্ষরও বাংলাদেশ করেছে প্রায় এক যুগ আগে। তো? বৈষম্য কি আদৌ দূর হয়েছে? ৪.১ নং অনুচ্ছেদটি তাহলে পড়া যাক:

#### ৪.১ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সন্দ :

“বট্ট, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সন্দ (সিডও) গঢ়ীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও ১৬(চ)] সংরক্ষণসহ এ সন্দ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সন্দে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রৱৃপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অতর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়েডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক পরিমঙ্গলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সন্দ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাদ্ব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। একই সময় Optional Protocol on CEDAW-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সন্দে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের

মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।”

অর্ধাঃ ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও ১৬(চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে-  
পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে যার মধ্যে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ  
প্রত্যাহার করা হয়। তার মানে, ধারা ২  
এবং ধারা ১৬ (ক) থেকে এখনও  
সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয় নি! ধারা ২  
ও ধারা ১৬ (ক) এ সংরক্ষণ রাখার  
কারণ এগুলো নাকি কোরআন-সুন্নাহর  
পরিপন্থী!

তাহলে শুরুতে ধারা ২ এবং ধারা ১৬ (ক) -ই দেখা যাক:

ধারা ২:

### Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

To establish legal protection of the

rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

ধারা ১৬ (ক):

### Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

(a) The same right to enter into marriage;

(সত্ত্বঃ<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article2>)

সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে- ধারা ২ হচ্ছে পুরো সিডও সনদের একদম Policy Measures – যাকে বলা যায় সিডও সনদের প্রাণ তথা মূলনীতি। একে বাদ দিয়ে সিডও সনদে স্বাক্ষর করা (১ম ১০ স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম হওয়া)

আমার কাছে রেইনকোট পরে বৃষ্টিতে গোসল করার মতই মনে হয়েছে, কিংবা বলা যেতে পারে- মুক্তায় হজে যামু মাগার নামাজ পড়ুম না- এই টাইপের!!! এবং ১৬ নং ধারাটি হচ্ছে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি, শুধু এক লাইন: “বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের একই অধিকার”- এটাও বাদ দিয়ে স্বাক্ষর করা হয়েছে কেবল এই অযুহাতে যে তা কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হবে!!!! এবং এই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর কোথায়ও বলা হয় নি যে- ধারা ২ ও ধারা ১১ থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হবে!

ফলে, এবার আমাকে বলুন- সিদও সনদ ও কোরআন-সুন্নাহ পরম্পর পরিপন্থী হতে পারে, কিন্তু সিদও সনদে বাংলাদেশের স্বাক্ষর ও কোরআন-সুন্নাহ কি সাংঘর্ষিক? কিংবা নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও কোরআন-সুন্নাহ? যতই- এই নারী নীতি ২০১১ এর ১৭.২ ধারায় বলা হোক না কেন: “নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।”- এটা দ্বারা ধারা ২ ও ১৬ (ক) বাদ দিয়েই কেবল CEDAW এর প্রচার ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে!

৪.১ অনুচ্ছেদের পরেই আছে ৫ নং ধারা: নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান। সেখানে সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) ও ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ তুলে ধরা হয়েছে। “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্গ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না” (২৮/১) বা “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্গ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিলোদন বা বিক্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না” (২৮/৩) বা “নারী বা শিশুদের অনুচ্ছেদে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অন্তর্সর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নির্বাচ করিবে না” (২৮/৮) বা “প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে” (২৯/১) কিংবা “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্গ নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না” (২৯/২) নারী নীতির ৫ নং ধারায় সংবিধানের এইসব অনুচ্ছেদ পড়তে কতই না ভালো লাগে- অনেক সময় এমনও মনে হতে পারে- এ বুবি ১মবারের মত এই নারী নীতিরই আবিষ্কার! বাস্তবে উল্লিঙ্কিত হওয়ার মত কিছু নেই। এ সমস্ত অনুচ্ছেদই ১৯৭২ সালে লিখিত (৬৫/৩ ব্যতীত)। বাস্তবে আমাদের সংবিধানটাই হচ্ছে স্ববিরোধিতায় ভরপুর- সংবিধানের উপরিউক্ত অনুচ্ছেদগুলো বলুণ্ঠ থাকলে কোন প্রকারেই সংবিধান স্থীকৃত ব্যক্তিগত

পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ও সংশোধনী ১৯৮৯, বিবাহ সংক্রান্ত আইন প্রত্বতি কোন প্রকারেই টিকার কথা নয়। অর্থ- উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে ইউনিফরম ফ্যামিলি কোডের পরিবর্তে মুসলিম পারিবারিক আইন (পুত্র কন্যার দ্বিতীয় পাবে), হিন্দু আইন (বৌদ্ধদের জন্যও একই: আরো বর্বর- কন্যা সন্তান কিছুই পাবে না) প্রত্বতি এখন চলছে- মুসলিম বিবাহ আইন, হিন্দু বিবাহ আইন প্রত্বতিও চলছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে- সাক্ষ্য আইন ১৯৭২ ও চুক্তি আইন ১৯৭২ দ্বারা সাক্ষ্য হিসাবে বা চুক্তিসম্পাদনকারী হিসাবে নারী ও পুরুষ সমান হিসাবে বিবেচিত হলেও- মুসলিম বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ের সাক্ষ্য হিসাবে ১জন পুরুষ সমান ২ জন নারীই কেবল নয়, ২ জন পুরুষের ক্ষেত্রে ৪ জন নারী থাকলেও চলবে না- কমপক্ষে ১ জন পুরুষ থাকতেই হবে!!!! (২ জন পুরুষ সাক্ষ্য থাকলে নারী সাক্ষ্যের কোন দরকার নেই!!)

যাহোক, যেটা বলছিলাম- খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে যে নারী নীতিতে উল্লিখিত সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলোর প্রায় সবই ১৯৭২ সালে রচিত হলেও সেগুলো ৪১ বছর ধরে কেবল কথার কথা হিসাবে রয়ে গিয়েছে, কেননা এই সংবিধান অনুযায়ীই মুসলিম-হিন্দু-শ্রিস্টান বিবাহ আইন, উত্তরাধিকার আইন এগুলো আমাদের দেশের প্রচলিত আইন। সুতরাং- এই সব প্রচলিত আইন রাদের বিষয়ে কোন সুপারিশ না রেখে-

নারীর অবস্থা যা ছিল তাই থাকবে। এটা কেবল বিদেশ দাতাগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার একটা কৌশল মাত্র। এনজিওগুলোরও কিছু চাপ থাকতে পারে। উদ্দেশ্য যাই থাক- ফলাফল আমার মনে হয়েছে খুব নেতৃত্বাচক।  
নারীর প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে, নারীর সমান অধিকার চাইলে, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ চাইলে সবার আগে দরকার নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন পুরুষতাত্ত্বিক কুসংস্কার দূর করা যাবে, এই পুরুষতাত্ত্বিক কুসংস্কার যেহেতু পুরুষদের তৈরি ধর্মসমূহের লালন- পালনে-আশ্রয়ে পরিপূর্ণ হয়, সেহেতু নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুরুষতাত্ত্বিক ধর্মসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক, কোরআন-সুন্নাহ, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল-তাওরাত প্রত্বতির নারী বিরোধী বক্তব্য/ অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই তা আদায় করতে হবে।

কেবল ঐসবের উল্লেখ শুভকরের ফাঁকি ছাড়া কিছুই না। আলবৎ এগুলো ধোঁকাবাজি। নারী উন্নয়ন নীতির ২য় ভাগ দেখুন। এখানে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য(১৬) হিসাবে প্রথমেই বলা হয়েছে: ১৬.১ “বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।” বর্তমান স্বিভাবিত সংবিধানের আলোকে আপনারাই বলেন- কতটুকু সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

এবারে আসি ২য় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়কে বলতে পারেন- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর মূল পদক্ষেপ/ নীতি / লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য (২২ টি ধারা)
১৭. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (৯ টি ধারা)
১৮. কল্যাণ শিশুর উন্নয়ন(৮ টি ধারা)
১৯. নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ (১১ টি)
২০. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা (৩ টি)
২১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (৩)
২২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (৪)
২৩. জাতীয় অর্থনৈতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ (১১ টি)
২৪. নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ (৫ টি)
২৫. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (২ টি)
২৬. নারীর কর্মসংস্থান (৬ টি)
২৭. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৩ টি)
২৮. সহায়ক সেবা (১ টি)
২৯. নারী ও প্রযুক্তি (৩ টি)
৩০. নারীর খাদ্য নিরাপত্তা (৩ টি)
৩১. নারী ও কৃষি (৪ টি)
৩২. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (৯ টি)
৩৩. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন (৭ টি)
৩৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (১১ টি)
৩৫. গ্রহণযোগ্য ও আশ্রয় (৩ টি)
৩৬. নারী ও পরিবেশ (৩ টি)
৩৭. দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা (১০ টি)
৩৮. অন্তর্সর ও শুন্দি মৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম (৩ টি)
৩৯. প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম : (৬ টি)
৪০. নারী ও গণমাধ্যম (৪ টি)

এসবের মাঝে অনেক ধারাই আছে যেগুলো নিয়ে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে আইন পর্যন্ত আছে কিংবা সব সরকারের কর্তৃব্যক্তিরা মুখে হলেও নীতিগত সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু

আদতে সেগুলোর বাস্তবায়ন কঠটা হচ্ছে তা দেখার ফুসরত কখনো কারো হয় নি ( যেমন: নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা, নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা, নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি )।

ফলে, এসব ধারা বা লক্ষ্য কীভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তা উল্লেখ না থাকলে যথারীতি একটা অনাঙ্গ তৈরি হয়ে যায়, কেমনা এসব সুন্দর সুন্দর কথা আমাদের সেই কোন আমল থেকেই শোনানো হয়েছে এবং এখনো শুনছি, যদিও উপর উপর ও লোকদেখানো কিছু কর্মকাণ্ড ছাড়া কার্যকর কোন পদক্ষেপই চোখে পড়েন কখনো।

নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্য শীর্ষক অনুচ্ছেদের ১৭.৫ নং লক্ষ্য তথা নীতিটি দেখি: “স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী-স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিভোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা উদ্যোগ গ্রহণ না করা।” পড়ে আবাক হই এবং ভাবি- কেন আমিনী গং এই নারী নীতির বিরচন্দে এত চেঁচামেচি করছে? হাইকোর্ট পর্যন্ত যে ফতোয়ার বিরচন্দে রায় দিয়ে বসেছে (এবং আপিল বিভাগের রায়ের অপেক্ষায় আছে)- এই নারী নীতি ২০১১ ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করার সাহস ধারণ করে না। বরং ফতোয়াকে একভাবে জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে এখানে। উল্লিখিত ১৭.৫ নং নীতি একটু ভালো করে পড়লেই আশা করি বুবাতে পারবেন। “কোন ধর্মের কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিভোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে না। এই বাক্যটি দ্বারা আসলে কী বুবায়? ধর্মীয় অনুশাসনের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে তাহলে? নাকি- এই নীতিমালা প্রণেতারা মনে করেন যে- ধর্মীয় অনুশাসনের সঠিক মোতাবেক যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন- তা-ই হয়ে যাবে নারীর স্বার্থানুযায়ী?

সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে- এই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রকাশের পর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে পারিবারিক উত্তরাধিকার আইন নিয়ে। আমিনী ও তাবৎ মো঳া থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের পুরুষেরা হায় হায় করে উঠেছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টন বিষয়ে, ভয়ে চিংকার করে উঠেছে- এবং কোনমতেই যাতে পৈতৃক সম্পত্তিতে নারী পুরুষের সমান ভাগ না পায় সে-ব্যাপারে উচ্চকিত থেকেছে! বিভিন্ন জায়গায় এর পক্ষে-বিপক্ষে ডিবেট হয়েছে। আমার মা- ও একদিন তার অফিস থেকে হতাশ হয়ে এসে বললেন-

শিক্ষিত মানুষেরাও (আমি সংশোধন করে দিয়েছিলাম- “বলো পুরঘরেৱা”) যদি না বুবো- আজে বাজে যুক্তি করতে থাকে- তাহলে কেমন করে হবে! (কয়েকটা মজার যুক্তির কথা মা বললো- “ মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচ করতে হয়”!! “ মেয়ে তো বিয়ের পরে চলে যাব”!! “ মেয়ের তো লস হচ্ছে না- তার স্বামীতো আবার ঠিকই দিগণ সম্পত্তি আনছেই” ইত্যাদি)

এমন যুক্তি-তর্কের বড়, অথচ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তন্ন করে খুঁজেও আমি উত্তরাধিকার ও সমানাধিকার একসাথে কোন জায়গাতেই পেলাম না। অবাক ব্যাপার তাই না? একদল আওয়ামীলীগ কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কাজ করে ফেললো বলে জিকির তুলছে আর অন্যদিকে আমার মা ও অনেকেই আওয়ামী-লীগকে- হাসিনাকে প্রগতিশীল ভেবে গদগদ হয়ে যাচ্ছে! এই মিথ্যা প্রচারণাটা চালালো কে? হাসিনাদের বক্তব্য অনুসরে আমিনী গং!

নারী নীতি ২০১১ খুঁজে নীচের ধারাগুলো পেলাম- যেগুলো দেখে অনেকে এমন মনে করতে পারে যে- উত্তরাধিকার সমান অধিকার দেওয়া হচ্ছে:

**“২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেওয়া।**

**২৫.২ উপর্জন, উত্তরাধিকার, খণ্ড, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।”**

মজার ব্যাপার হচ্ছে- সম্পদ মানে কেবল উত্তরাধিকার বুবায় না। রাষ্ট্রীয়/পাবলিক সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা বেশি প্রয়োজন এখানে। ফলে, নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে এসব ক্ষেত্রে। আর, ২৫.২ ধারাটিতে উত্তরাধিকার শব্দটি উল্লেখ করা হলেও সমান অধিকার শব্দটি স্থানে নেই- আছে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ উত্তরাধিকার বন্টন কেমন করে হবে- সে বিষয়ে কোন কথা নেই, আছে- তা যেমনেই বন্টন করা হোক না কেন- বন্টিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে নারীর!! এটা আসলে, একরকম ধাক্কাবাজিই- এমন ভাষায় প্রকাশ করেছে যে হঠাৎ মনে হবে- কতই না প্রগতিশীল- ভালো করে তাকালে বোঝা যায়- পুরাটাই ঠন্ঠন!!

আর সে কারণেই- শুরুতে আওয়ামী লীগ সুশীল সমাজের উদ্দেশ্যে প্রচার করলো- তারা কত প্রগতিশীল- নারীদের সমান অধিকার দেওয়ার জন্য নারী উন্নয়ন নীতিমালা করেছে, নারীদের প্রতি সমস্ত বৈষম্য তারা দূর করে ফেলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর, যখনই আমিনীরা একটু নড়েচড়ে বসলো- তখন সমস্বরে সমস্ত আওয়ামী লীগাররা বলা আরম্ভ করে দিলো যে- “এতে কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু নাই,

নীতিমালা পড়ে আসেন, ওপেন চ্যালেঞ্জ- একটা নীতি বের করতে পারবেন না যেটা কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী” ইত্যাদি।

হরতালের আগের দিন তো ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে সমস্ত দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে ছাপানো হলো যে- আমিনী গং দের সমস্ত দাবিই  
মিথ্যা  
(সূত্র:  
<http://eprothomalo.com/index.php?opt=view&page=13&date=2011-04-03>)

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য নিয়ে বলার কিছু নেই- নারী নীতি ২০১১ পড়ার পরেই মনে হয়েছে- এগুলোর আসল অর্থ কী। এই বিজ্ঞপ্তিতে দেখার মতো বিষয়টা হচ্ছে- বিসমিল্লাহ আর আসসালামের ছড়াচড়ি! বুঝেন তাইলে- এই হইলো আমাদের সেকুলার(!) আওয়ামী লীগের চেহারা!

আমার যেটা মনে হয়েছে- নারীর অবস্থা যা ছিল তাই থাকবে। এটা কেবল বিদেশি দাতাগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার একটা কোশল মাত্র। এনজিওগুলোরও কিছু চাপ থাকতে পারে। উদ্দেশ্য যাই থাক- ফলাফল আমার মনে হয়েছে খুব নেতৃত্বাচক। নারীর প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে, নারীর সমান অধিকার চাইলে, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ চাইলে সবার আগে দরকার নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন পুরুষতাত্ত্বিক কুসংস্কার দূর করা যাবে, এই পুরুষতাত্ত্বিক কুসংস্কার যেহেতু পুরুষদের তৈরি ধর্মসমূহের লালন-পালনে-অঙ্গায়ে পরিপুষ্ট হয়, সেহেতু নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুরুষতাত্ত্বিক ধর্মসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক, কোরআন-সুন্নাহ, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল-তাওরাত প্রভৃতির নারী বিরোধী বক্তব্য/ অনুশাসনের বিরক্তে দাঁড়িয়েই তা আদায় করতে হবে। হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ যে নারী নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে- সেখানে এই প্রয়োজনীয় কাজটি সুচারূভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের পুরাতন অর্জনগুলো এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন এসব এই নারী নীতিতেই প্রথম আমদানি করা হয়েছে এবং আমিনী গংদের কোরআন-সুন্নাহ গেল গেল রবের মুখে শাসক গোষ্ঠীর সমস্বরে কোরআন-সুন্নাহ আছে আছে বলে জবাবে আমাদের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নেতৃত্বাবে কিছুটা হলেও দুর্বল হলো- কেননা চারিদিকে কেবল এটাই প্রচারিত হলো- কোরআন-সুন্নাহ’র বিপরীত কিছু করা যাবে না এবং করা হয় নি।

নাস্তিকের ধর্মকথা, ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক। মুক্তমনা সাইটে নিয়মিত ব্লগার হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।